মসলার ইতিহাস

শবনম শিউলী

ভেবে দেখুন তো শুধু তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন আর মরিচ দিয়ে কড়াইতে বসিয়ে দিলেন মাংস। কেমন লাগবে? নাহ হলো না, এই খাবারকে সুস্বাদু করে তোলে কী? হ্যাঁ, মসলা। এক এক পদের রান্নায় দরকার হয় এক এক মসলা। মাছের আঁশটে গন্ধ ছাড়াতে ব্যবহার হয়ে এক মসলা তো মাংসের গন্ধ ছাড়াতে ব্যবহার হয় অন্য মসলা। মসলাতেই থাকে রান্নার আসল জাদু। রাঁধুনির হাতের মজাদার খাবার খেতে হলে প্রয়োজন বাড়তি কিছু মসলাপাতির। খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্নরকম আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহকে মসলা বলে। বাঙালির ঘরে ঘরে এমন কোনো হেঁসেল নেই যেখানে হরেক রকমের মসলা পাওয়া যাবে না। মাছ, মাংস, শাকসবজির প্রকারভেদ অনুযায়ী বাঙালি গৃহবধূরা বেছে নেন নানা প্রকারের মসলা। তবে বাঙালির হাত ধরেই যে মসলার উৎপত্তি, ব্যপারটা এমন নয়।

মসলাকাহন

খাবার ও মসলা যেমন একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত তেমনি খাবারের ইতিহাসের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে মসলার ইতিহাসও। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যের প্রথম ও প্রধান পণ্য ছিল মসলা। এক সময় মসলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো আরব বণিকরা। সেই আধিপাত্য ভাঙতেই একদিন মসলার খোঁজে ইউরোপীয়রা জাহাজ ভাসিয়েছিল সমুদ্রে। এরপর মসলার বাণিজ্য পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিয়েছিল চিরকালের মতো। ৩৭ বছর বয়সী ভাস্কো ডা গামা সেই মসলার খোঁজেই একদিন জাহাজের নোঙ্গর নামান কেরালার মালাবার উপকূলে। একসময় মসলাই ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্র। প্রথম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন লেখালেখিতেও মসলার কথা পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে উটের কাফেলায় করে মসলা কালিকট, গোয়া ও পূর্ব থেকে কার্থেজ, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমে পাঠানো হতো। এক সময় ভারতীয় মসলা পেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতো বণিকরা। সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরব বণিকরা পশ্চিমে ভারতীয় মসলা সরবরাহ করে। কিন্তু তারা মসলার মূল উৎসকে গোপন রাখে। ইউরোপীয়রা তাদের নিষ্প্রাণ খাবারকে সুস্বাদু করতে মসলার উৎসের খোঁজে সমুদ্র অভিযানে বের হয়। কিন্তু চাহিদা যত বেশি ছিল, মসলা সংগ্রহ ছিল ততটাই কঠিন। মধ্য ইউরোপে মসলা ছিল খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র আদানপ্রদানের অন্যতম ধারক ও বাহক।

বাইবেলে কথিত আছে, রাজা হযরত সোলায়মান (আ.) গানে গানে জাফরান ও দারুচিনির গুণাগুণ ব্যক্ত করতেন। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রানী শেবা জেরুজালেম ভ্রমণের সময় রাজা সলোমনকে অঢেল স্বর্ণ, মণিমাণিক্য ছাড়াও অনেক দামী সুগন্ধি মসলা উপহার দেন। ইন্দোনেশিয়ার সুবৃহৎ মলুক্কাস দ্বীপ। ইংরেজিতে স্পাইস আইল্যান্ড নামে পরিচিত এই দ্বিপটি ছিল প্রাচীন যুগে চীনের মসলা যোগানের ভান্ডার। চীনে এই দ্বিপটি থেকে পৌঁছাত নানান মসলা। এই মলুক্কাস দ্বীপ থেকে সমুদ্রপথে পৌঁছত জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গসহ আরো কিছু আয়ুর্বেদিক গুণসমৃদ্ধ মসলা। তৎকালীন চীনা রাজসভায় সম্রাটদের সাথে কথোপকথনের সময় প্রত্যেক সভাসদেরই মুখে লবঙ্গ রাখার নিয়মও প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রপথের মাধ্যমে তাজা আদা সরবরাহ করা হতো, যার উদ্দেশ্য ছিল তাজা খাবার সংরক্ষণ ও স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ। ফার্দিনান্দ ম্যাগেল্লান, ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও ভাস্কো দা গামা তাদের ঐতিহাসিক অভিযানে এশিয়ার মসলা ভূখণ্ডে নতুন রুট খুঁজে পেয়েছিলেন। সুগন্ধি ও কাপড়ের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, চীন, সুমেরিয়া, মিশর ও আরবে মসলার বাণিজ্য করতো ভারত। গুণগত মানের মসলা বাণিজ্য আয়ত্ত করার জন্য উৎসুক অন্যান্য শক্তিশালী সাম্রাজ্য থেকে ভারতে লম্বাপথ ও কঠিন সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আসতো ব্যবসায়ীরা।

ভারতবর্ষে আসার আগে ইউরোপে মসলার ব্যবসা করত ইতালির ভেনিস রাজ্য। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায় ভেনিসের ব্যবসায়ীদের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে পর্তুগিজরা ক্রুদ্ধ হয়, নিজেরাই মসলার মূল উৎসে হাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সমৃদ্ধ নৌশক্তি, নিজেদের শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণি ও রাজার সমুদ্রপথ জয়ের তাগাদা তাদের স্বপ্নের পালে হাওয়া লাগায়।

মসলা যখন ওষুধ

খাবার কি মানুষ এমনিতেই খায়? খাবারের আছে পুষ্টিগুণ। এক এক সবজি, তরকারি, মাছে, মাংসের যেমন আলাদা আলাদা পুষ্টিগুণ থাকে, তেমন এক এক ধরনের মসলারও আছে এক এক পুষ্টি গুণ। মসলা আবার অনেক রোগের পথ্য হিসেবেও ব্যবহার হয়ে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। বিশেষ করে ঘরোয়া টোটকা আমরা যাকে বলি, তার বেশিরভাগই মসলা জাতীয় উপকরণ থেকেই এসে থাকে। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে পেঁয়াজ, রসুনসহ অন্যান্য কাঁচা মসলাকে সুস্বাস্থ্য, সুদৃঢ় মনোবল এবং আদর্শ খাদ্যাভ্যাসের প্রতীক ছিল। তারা চিকিৎসাব্যবস্থায় পেঁয়াজ, রসুন, ধনেপাতা, মেথি, মৌরি, গোলমরিচসহ আরো নানা মসলার ব্যবহার করতো। তৎকালীন মিশরীয়রা এমনকি ফারাওদের পিরামিডে তাদের কফিনের কাছে এসব মসলা রেখে দেওয়া হতো বলেও শোনা গিয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, পরবর্তী জীবনের পূর্ণতা ও দীর্ঘায়ু লাভ করাই এসব মসলা ব্যবহারের অন্যতম কারণ। এছাড়া, মিশরীয়দের দৈনন্দিন খাবারে এলাচি ও দারুচিনি ছিল অপরিহার্য, যা আসত সুদূর ইথিওপিয়া থেকে। বিভিন্ন চীনা প্রবাদ ও মিথোলজিতেও রয়েছে মসলার দারুণ সব আখ্যান। খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ শতকে বিখ্যাত চৈনিক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ শেং নুং তার ক্লাসিক হারবাল নামক বইয়ে লিখে যান একশোরও বেশি ঔষধি গুণসমৃদ্ধ মসলার কথা। এসবের মাঝে অন্যতম ছিল ক্যাসিয়া নামক দারুচিনি গোত্রের মসলা, যা চীনা ভাষায় কুয়েই নামে পরিচিত। কালক্রমে দক্ষিণ চীনের কুয়েলিন নামক প্রদেশে ক্যাসিয়া সমৃদ্ধ একটি গোটা জঙ্গলই আবিষ্কার করেন নৃতত্ত্ববিদরা।

বাঙালি ও মসলা সমাচার

বাঙালির রসনা বিলাসের ইতিহাসও কম নয় কোনো অংশে। মোটামুটি কয়েক শো বছর পাড়ি দিয়ে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই জায়গায় এসেছে আমাদের রসনা বিলাস। আর সেই মসলা বাড়িয়েছে খাবারের স্বাদ। এ কারণেই দেশের সীমা পেরিয়ে ভিনদেশেও ছড়িয়েছে সেই রান্নার সুখ্যাতি। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, জিরা, ধনে, হলুদ, মরিচ, লং, দারুচিনি, কালিজিরা, মেথির মতো এত সব বাহারি মসলা বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। যেকোনো উৎসব যেমন ঈদ, পূজা কিংবা বিয়ে, এ সময়ে যে খাবারের দীর্ঘ তালিকা তৈরি হয়, সেখানে মসলার ব্যবহার থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ। এই সুস্বাদু রান্নায় বাহারি মসলার ব্যবহার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ফসল। এই অঞ্চলের মাটি, রোদ-বৃষ্টি আর আলো-ছায়ার কল্যাণে এখানে গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদজগৎ। যা একদিন হয়তো ধরা হতো সাধারণ একটি গাছের পাতা হিসেবে, তার সুগন্ধি গুণই তাকে করে তুলেছে মুল্যবান। কেউ হয়তো কখনো এই ঘ্রাণ পেয়ে তা ব্যবহার করেছেন পরীক্ষামূলকভাবে। আর সেখান থেকেই লোকের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়েছে এর ব্যবহার। আর এভাবেই তেজপাতা একদিন পৌঁছে গেছে হেঁসেলে হেঁসেলে। দারুচিনি যে গাছের বাকল, সেটা কে না জানে! এভাবে একে একে আরও মসলার নাম, যেগুলো কীভাবে এবং কবে রান্নার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বলা মুশকিল। তবে এগুলো সম্পর্কে ইতিহাসে কোনো নিখুঁত ও তথ্যবহুল যুক্তি নেই। তবে এ কথা সত্য, এখানকার প্রকৃতির এসব উপহার কিন্তু দিনে দিনে বাড়িয়েছে আমাদের জিহ্বার স্বাদ।

বিলুপ্ত মসলা

সিলফিয়াম একটি অজ্ঞাত উদ্ভিদ যা শাস্ত্রীয় প্রাচীনকালে একটি মসলা, সুগন্ধি, অ্যাফ্রোডিসিয়াক এবং ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এটি প্রাচীন উত্তর আফ্রিকার শহর সিরিন থেকে বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য দ্রব্য ছিল। তবে সিলফিয়ামের পরিচয় অত্যন্ত বিতর্কিত। নমুনা ছাড়া এর কোনো জেনেটিক বিশ্লেষণ করা যাবে না। এটি সাধারণত বিলুপ্ত বা জীবিত প্রজাতি হিসেবে ফেরুলা গণের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। প্রাচীন রোমান সভ্যতায় এককালে বেশ আধিপত্য বিস্তার করেছিল এই উদ্ভিদটি। আজ বিলুপ্ত হলেও এককালে এটি ব্যবহৃত হতো অনেকভাবে। বিশেষ করে উচ্চশ্রেণি ও উচ্চবংশীয় রোমানদের বহুল ব্যবহারের কারণেই তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দাভাব আনতে দেয়নি এই সিলফিয়াম। তরকারিতে মসলা হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও সুগন্ধিদ্রব্য হিসেবে এর ছিল বেশ সুনাম। এটি প্রাচীন গ্রিক এবং রোমানদের কাছে গর্ভনিরোধক হিসাবেও ব্যবহৃত হতো।